ছেলেবেলার পুজো

জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী
এফ.ই ২৩৮

আমার পুজো

সেবক বৈদ্য রোডে, আমাদের বাড়ির পাশে বৈজয়ন্তী সংঘের পুজো আর শহরের পিঠ তোলপাড় করে স্বাধীন ঘোরাঘুরি। মনে পড়ে সুদীবর, মন্টু, আমরা কয়েকজন হাত ধরাধরি করে অবাধে হেঁটে চলেছি। দেশপ্রিয় পার্ক, কালিঘাট, আহিরিটোলা, কলেজ স্কোয়ার থেকে বাগবাজার। দক্ষিণের পুজো তখন জৌলুসহীন, বেহালা, টালিগঞ্জ বা কসবার ওপর তখন গজাঢ় জঙ্গল। পুজো মানেই উত্তর কলকাতা। পুজো মানেই পাড়ার রকে, অবাধ আড্ডা; হয়ত গড়িয়াহাটের 'আলোতে' ইংরাজী ছবি কিংবা অলস উপুড়ঝুপুর দুপুরে 'হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যক্ষের ধন বা শুকতারা কিংবা শার্লক হোমস্'-এ ডুব দেওয়া। পুজো মানেই স্বাধীনতা। তবে রাত নটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে রক্তচক্ষু। পুজো মানেই অষ্টমীর দিন দুপুরবেলায়, কাঁসার থালায় মা, জেঠিমার রান্না করা লুচি, পাঁঠার মাংস। এখনও পুজোর সময়ে সেই পুরোনো গন্ধ ফিরে আসে। এই ছিল স্পেশাল খাওয়া-দাওয়া।

ছোটবেলায় কখনও গেছি আমাদের টাকীর জমিদার বাড়িতে। নবমীতে হত মোষবলি, আমাদের কামার প্রজারা পেটপুরে খেত। নতুন সাজে, নতুন তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত দিনগুলি। ইচ্ছামতী নদীতে ভাসান হত। নৌকাতে ওঠার সম্মতি পেতাম না। তারিকুল চাচার হাত ধরে, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম মা চলে যাচ্ছে। সেই তারিকুল চাচা, আমাদের কুলপুরোহিতের ছেলেকে শিখিয়েছিলেন সঠিক পুজো পদ্ধতি। তারিকুল চাচার সেই শাসন, টাকীতে আমার ছেলেবেলার পুজোর অন্যতম সজীব দৃশ্য।

দুর্গাপুজোর মতো জাঁকজমক ছিল না কালিপুজোতে। আমাদের কাজ ছিল চেতলাহাট থেকে বাজির মালমশলা কিনে উড়নতুবড়ি, বসন তুবড়ি বানানো। পাশের বাড়ির একটি ছেলের বাজি বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তাই মায়ের ছিল প্রবল নিষেধ ও আপত্তি—যাবি না এইসব ভয়ংকর বাজি পটকায়।' এখন স্মৃতির রোমন্থনে ভাবি, সেই নিষেধের বেড়াজালকে একপাশে সরিয়ে রেখে, সারাটা জীবনই গেল ভয়ংকর বোমাবারুদের মুখোমুখি হয়ে—সে এক অন্য গল্প—

সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন—পৃথ্বীজিৎ রায়
এফ.ই ২০১

পুজোর তখন পুজোর এখন

সত্যম রায়চৌধুরী
এফ.ই ৪০১

আমার পুজো

আমার ছোটবেলাটা কেটেছে মফস্বলে। নামে মফস্বল হলেও আমাদের সেই অঞ্চলে সাদামাটা গ্রাম্য জীবনের ছোঁয়াটাই ছিলো অনেক বেশি। অনাবশ্যক শহুরে হয়ে ওঠার ঘোরতর প্রচেষ্টা আর তাগিদটা ছিলো না বলেই। অনেক বেশি উদার-অবারিত-উন্মাদ প্রকৃতির সবুজ সান্নিধ্যে ছেলেবেলাটা কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। মাটির খুব কাছ থেকে, মাটির গন্ধ মেখে কাটিয়েছি আমার শৈশব-বাল্য-কৈশোরের দিনগুলো।

প্রকৃতির স্পর্শ মাখা ওইরকম গ্রাম্য জীবনে সব ঋতুকেই তখন আলাদা আলাদা করে চিনতে পারা যেত, অনুভব করা যেত। তখন তো আর এখনকার মতো এই তথাকথিত শহুরে-আধুনিকতার দূষণের বিষে ঋতুবৈচিত্র্য হারিয়ে যায়নি, সেই অনাবিল-অবারিত-মুক্ত প্রকৃতিতে প্রটি ঋতুকেই আমরা হাত বাড়ালেই যেন ছুঁয়ে দেখতে পারতাম।

ছোটবেলায় শরৎকালটা এলেই, মনটা একটা অন্যরকমের আনন্দে নেচে উঠতো। শরৎকাল মানেই দুর্গাপুজো আর দুর্গাপুজো মানেই লাগামছাড়া আনন্দে ভেসে যাওয়া। তাই শরৎ এলেই, একটা বাড়তি উৎসাহ আর উদ্দীপনা তৈরি হতো মনের মধ্যে। আসলে ছেলেবেলায় আমাদের পুজোটা ঠিক পুজোর ওই পাঁচটি দিনকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পুজোর প্রায় এক-দেড় মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত আমাদের উৎসব।

আমাদের পাড়ার একটি মন্দিরে দুর্গাপুজো হোতো, ইস্কুল যাওয়া-আসার পথে দেখতাম মন্দিরের দালানে প্রায় এক দেড় মাস আগে থেকেই ঠাকুর গড়ার কাজ শুরু হয়ে যেত। আমাদের স্কুলের পথেই মন্দিরটা পড়তো, ফেরার পথে রোজ গিয়ে বসে বসে দেখতাম ঠাকুর গড়ার কাজ কতটা এগালো। দেখতাম, বাঁশ আর খড় দিয়ে কেমন করে কাঠামো তৈরি হতো, মূর্তির হাত হত, পা হতো, তারপর পুরো কাঠামোতে মাটি লেপা হতো এইসব। পুজোর তিন-চারদিন আগে পুরো মাটি মূর্তিটা তৈরি হয়ে যেত। তারপর রং চড়ানো হতো, ঘামতেল লাগানো হতো, এবং সবশেষে হতো চক্ষুদান। অত ছোটবেলা থেকে প্রতিবছরই ঠাকুর গড়ার কাজ দেখতে দেখতে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম। কেমন করে ঠাকুর গড়া হতো, সেটা পুরোটাই জানতাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, চোখের সামনে থেকে মূর্তি গড়ার পুরো প্রক্রিয়াটি দেখলেও, পুজোর সময় কখনই মনে হতো না, যে ওটা মাটি মূর্তি—কেমন যেন জীবন্ত মনে হতো! পুরো পরিবেশটাই কিভাবে যেন পাল্টে যেত।

সেসময় তো আর আজকের মতো অলিতে-গলিতে এতো অসংখ্য বারোয়ারি পুজো হতো না, আমাদের ওই অঞ্চলে, সব মিলিয়ে বড়োজোর পাঁচ-ছ'টা মতন পুজো হত। একটা পুজো মণ্ডপ থেকে আরেকটা পুজো মণ্ডপের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব থাকতো। এখনকার মতো পাড়ায়-পাড়ায় গায়ে-গায়ে অজস্র পুজো প্যান্ডেলের দেখা মিলতো না। আমাদের দু তিনজন বন্ধুর একটা দল ছিল, আমরা সকাল-সন্ধ্যে হেঁটে হেঁটে প্রতিদিন ওই সবকটা পুজোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। একই জায়গা বারবার যেতাম রোজ, দেখতাম কোথাও হয়তো প্রসাদ দেওয়া হতো, কোথাও আরতি হতো, কোথাও ভোগ নিবেদন হতো, সারাদিন ঘুরে ঘুরে এইসব দেখতাম...

পুজোর সময় আমাদের কাছে সবথেকে আকর্ষণীয় যে বিষয়টা ছিল, সেটা হলো ধুনুচি নাচ। বন্ধুর দাদারা-কাকুরা সব ধুনুচি নাচ করতেন। এঁদের মধ্যে যারা ভালো ধুনুচি নাচ নাচতেন, তাঁদের আবার অঞ্চলে খুব নামডাক ছিল। দেখতাম কখনও মাথায় ধুনুচি নিয়ে, কখনও মুখে নিয়ে, কখনও হাতে নিয়ে ধুনুচি নাচিয়েরা ঢাকের তালে তালে নাচ করছেন; —এই ধুনুচি নাচ বস্তুত ছিল আমাদের কাছে সব থেকে মজার এবং যথেষ্ট বিস্ময়ের বিষয়। ধুনুচি নাচের এই পরম্পরা

হয়তো আজও একইভাবে চলে আসছে, এখনও বহু জায়গায় পুজোর সময় ধুনুচি নাচ হয়, অনেক জায়গায় ধুনুচি নাচের প্রতিযোগিতাও হয়, —কিন্তু ধুনুচি নাচকে ঘিরে ছোটবেলার সেই আনন্দ অনুভবটাকে আজ যেন আর কোথাও খুঁজে পাইনা...

বিজয়া দশমীর দিনটা ছিল আবার আমাদের কাছে অন্যরকমের একটা মজার দিন। ওইদিন প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে, একটা বাড়তি রকমের উৎসাহের ব্যাপার ছিল আমাদের। আমাদের ওখানে স্থানীয় নদীতে অঞ্চলের সবকটা প্রতিমার বিসর্জন হত, —বিসর্জনের দিন নদীর ধারে বহু মানুষ জড়ো হতো প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে। অনেকে আবার অতি উৎসাহী হয়ে নৌকো ভাড়া করে নদীতে ভেসে পড়তেন সামনে থেকে বিসর্জন দেখার অভিজ্ঞতাটা উপভোগ করবে বলে। আমরাও পরিবারের সবাই মিলে, পাড়ার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে, একটা ছই দেওয়া নৌকো ভাড়া করে, দশমীর দিন দুপুর বেলা থেকে ভেসে পড়তাম নদীতে। নৌকায় বসে বসেই দেখতাম একের পর এক নিরঞ্জন। বিসর্জন করতে আসা নৌকাগুলোর ওপর, নিরঞ্জনের আগে দেবীর আরতি করা হতো, নৌকার ওপরেই ধুনুচি নাচ হতো, প্রত্যেকটা পুজোর দল নৌকোর ওপরেই নিজেদের বিশেষত্ব, নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করত—সব মিলিয়ে যেন একটা হুলস্থূল রকমের ব্যাপার হতো!

ওইসময়ে আবার আমাদের ওই অঞ্চলে নদীর তীর ধরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে মেলা বসতো। বিসর্জন দেখা শেষ করে, নৌকো থেকে নেমে আমরা সেই মেলায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রচুর জিনিসপত্র কিনতাম, এটা-সেটা খেতাম, দারুণ মজা হতো।

পুজোর সময় কোনও কোনও বছর আবার মামার বাড়ি যাওয়া হতো, সেটা ছিল আবার অন্যরকমের একটা স্ফূর্তির ব্যাপার। পুজোর দিনগুলোতে মামারবাড়ি মানে নিশ্চিত ভাবেই অফুরন্ত মজা, —দেদার খাওয়া-দাওয়া, প্রচুর হৈ-হৈ, আর লাগামছাড়া আনন্দে ভেসে যাওয়া। ওইসময়ে মামার বাড়ি যাওয়ার আলাদা একটা বাড়তি আকর্ষণের কারণও ছিলো আমাদের, সেটা হলো একটা অতিরিক্ত প্রাপ্তিযোগ। মামার বাড়ি গেলেই, দাদু একটা নতুন জামা দেবে, ওটা পাওয়ার টানটা খুবই লোভাতুর করে তুলতো আমাদের। পুজো উপলক্ষে কেনা মামার বাড়ির সেই নতুন জামা প্যান্ট হয়তো পরে বছরের অন্য সময়ে গেলেও পাওয়া যাবে, কিন্তু পুজোর দিনগুলোর মধ্যে একটা এক্সট্রা নতুন জামা-প্যান্ট পাওয়া যে বাড়তি আনন্দ, সেটাকে ছাড়তে ইচ্ছে করতো না।

ছেলেবেলার সেই দুর্গাপুজোর দিনগুলোকে হয়তো অনেক পেছনে ফেলে এসেছি, কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি সেই নিবিড় আনন্দের দিনগুলোকে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সেদিনের সেই পুজোর আঙ্গিকের সঙ্গে হয়তো আজকের পুজোর আঙ্গিকের অনেক তফাৎ হয়েছে। আধুনিকতার গন্ধ মেখে, সনাতনী রূপ বদল করে, হয়তো অনেক বেশি ঝাঁ-চকচকে আর জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে আজকের পুজো, সেটাও অবশ্য আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়, আনন্দ করিও প্রাণভরে। চেয়ে অথবা না-চেয়ে, অনেক ঠাকুর দেখে ফেলি বা দেখে ফেলতে হয়। কখনও কখনও সেরা প্রতিমা নির্বাচনের জন্য বিচারকের আসনেও বসতে হয়, সুতরাং তখন বাধ্য হয়ে অনেক ঠাকুর দেখা হয়ে যায়। কিন্তু তবুও বর্তমান সময়ে এত বিলাসী-বৈভবি পুজোর আয়োজনের মধ্যে আমার ছেলেবেলার সেই সরল-সাদাসিধে অনাড়ম্বর পুজার একচিলতে আনন্দের অনুভবটাকে আর কোথাও তেমন করে খুঁজে পাই না। হয়তো আনন্দ উপকরণের অনেক অভাব ছিল সেদিন, উৎসবের উদযাপনেরও এত রং, এত বৈচিত্র্য ছিল না, কিন্তু নেই নেই করেও ছিল অনেকখানি সহজিয়া আয়োজন, হৃদয়ে অনাবিল আবেগ আর সর্বোপরি প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দাক্ষিণ্য—যা আমাদের ছেলেবেলার দুর্গোৎসবগুলোকে করে তুলতো অনন্য; —যেটা আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া হয়তো বিরল...

আরেক কালের পুজো

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়
এফ ই ৭/৬

আমার পুজো

নস্ট্যালজিয়া শব্দটার বোধহয় কোনো সঠিক বাংলা হয় না। খুঁজেপেতে যেগুলো পেয়েছি, সেগুলো খুবই খটমট। সেগুলোর অর্থ খুঁজতে আবার অভিধান খুলতে হয়। একটা বয়সের পর ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি, পুরোনো স্মৃতির প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ, বলা যেতে পারে একটা মোহ জন্মায়। মনে হয় সে একটা স্বর্ণযুগ ছিল, তার তুলনায় এখন সবই যেন কেমন ম্রিয়মান।

ছেলেবেলায় পুজোর আগে দুটো ঘটনার জন্যে আমার ভাইরা আর আমি উদগ্রীব হয়ে থাকতাম — স্কুলের লম্বা ছুটি কবে শুরু হবে আর পুজোর নতুন জামাকাপড় তৈরীর জন্য কবে বেরোনো হবে। ষষ্ঠীর দিন তো বটেই, পুজোর অন্যান্য দিনগুলিতেও নতুন পোষাক আবশ্যিক ছিল। তখন রেডিমেড পোষাকের তেমন একটা চল হয়নি। আমার পিতা এসব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে — বলা যায় সাহেবী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শার্ট প্যান্টের জন্যে কাপড় পছন্দ করে যাওয়া হ'ত লিণ্ডসে স্ট্রীটের গ্লোব সিনেমার পাশের গলিতে এক দর্জির দোকানে মাপ দিতে। দোকানের নামটা মনে পড়ছে না, তবে এমন হতেই পারে যে দোকানটা আছে এখনও। সপ্তাহখানেক পরে আবার যাওয়া হ'ত ট্রায়াল দিতে, সব একেবারে নিখুঁত হয়েছে কিনা পরখ করে নিতে। তারপরে স্বস্তির নিশ্বাস! ষষ্ঠীর এবং পরের দিনগুলিতে নতুন পোষাকে ঠাকুর দেখতে যাওয়া। এখনও মনে আছে। তার আনন্দই আলাদা।

ছোটবেলায় আমরা থাকতাম দক্ষিণে ল্যান্সডাউন-হাজরার মোড়ে । তাই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড সংলগ্ন বিস্তৃত ম্যাডক্স স্কোয়ার পার্ক আমাদের বিচরণ ক্ষেত্র—বেড়ানো, খেলাধুলো,সব। আর ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজোকে অমাদের পুজো বলেই জানতাম। অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ খাওয়া সব সেখানে। এখনো, বিকেলে পুজো মণ্ডপ দর্শনের সাহস যখন সঞ্চয় করতে পারি, ওখানে একবার যেতেই হয়।

শহরের অন্যন্য অঞ্চলে যাওয়ার আর নামকরা প্যান্ডেল পরিদর্শনের দিনক্ষণ ঠিক করা থাকত। সে সময়ে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষের নিজস্ব গাড়ি থাকত না। আমাদেরও ছিল না। বাসে, ট্রামে, কখনো ট্যাক্সিতে, কখনো চেয়ে চিন্তে কারও গাড়ি ধরে করে চারদিন ধরে চলত পুজো দেখা। বাগবাজার, কুমারটুলি, সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-র ওপর ফায়ার ব্রিগেড, এদিকে হাজরা পার্ক ইত্যাদি।

আমার মামার বাড়ি ছিল সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউর মোড়ে। সেখান থেকে বউবাজারের দিকে যেতে একটা বিশাল বাড়ির একতলায় পুজো হ'ত, সেটা আমাদের কাছে একেবারে আশ্চর্যের ছিল। যন্ত্রচালিত অনেক কাণ্ডকারখানা হত। ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বলছে নিভছে, নদী দিয়ে নৌকা যাচ্ছে, নৌকার ওপর দেবদেবী এবং তাঁদের বাহন এইসব।

এই তো গেল পুজোর কথা। বাকি রইল শুভ বিজয়ার। একেবারে নিয়ম করে বিজয়ার দিন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যাওয়া হ'ত। সেটাও ছিল একটা অ্যাডভেঞ্চার। কারণ আমাদের পাড়ি দিতে হ'ত উত্তরপাড়া, বেলঘরিয়া, শেওড়াফুলী—বিভিন্ন জায়গায়। অনেক শাখা প্রশাখাযুক্ত প্রসারিত পরিবার হ'লে যা হয় আর কী।

আমার ছেলেবেলার পুজোর কথা সংক্ষেপে বললাম। তারও আগের যুগে উৎসব উদ্‌যাপন হয়ত আরও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে। আরো অনেক কথাই বলা যায়। সেটা হয়ত অন্য কেনোখানে হবে, অন্য কোন সময়ে।